গল্প: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ ও বরদা ■ ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

বয়স হয়েছিল।
বাজারে ওর একটা সোনারুপোর দোকান ছিল। তবে সেটা নামমাত্র।
তাঁর আসল কারবার ছিল – জহরতের।
হিসাবের খাতাপত্র থেকে জানা গেছে, মৃত্যুকালে তাঁর কাছে একরাশখানা
হীরা - মুক্তা - চুনি - পান্না ছিল – যার দাম – প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

এই দামী মনি মুক্তা তিনি বাড়িতেই রাখতেন। দোকানে রাখতেন না। অথচ আশ্চর্য এই – যে তার বাড়িতে একটা লোহার সিন্দুক পর্যন্ত ছিল না!
!!

কোথায় তিনি এগুলো রাখতেন তা কেউ জানে না।

খদ্দের এলে তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে নিজে শোবার ঘর থেকে প্রয়োজন মত জিনিস এনে দেখাতেন।

তাকে দেখে কিন্তু তার টাকাপয়সার কথা বোঝার উপায় ছিল না।

নিতান্ত সাদাসিধে, নিরীহ গোছের, গলায় কন্ঠি, সদাই জোড়হস্ত।
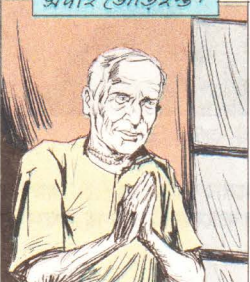
অসাধারন কৃপন লোক। শহরের সবাই তাকে এজন্য বৈকুন্ঠ থেকে ব্যয়-কুন্ঠ নাম দিয়েছিল।

একটি মেয়ে আর একটি হাবাকালা চাকর। এই ছিল তার সংসার।

গত ছাব্বিশে এপ্রিল, বাংলা ১২ই বৈশাখ, বৈকুন্ঠবাবু আটটার সময় দোকান থেকে বাড়ি ফিরে এলেন।

খাওয়া দাওয়া করে রাত নটার সময় দোতলার ঘরে শুতে গেলেন।

সকালবেলা খবর পেয়ে পুলিস দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখল –
বৈকুন্ঠবাবুর মৃতদেহ দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

গায়ের কোথাও আঘাত-চিহ্ন নেই, গলা টিপে খুন করা হয়েছে।

খুনী সমস্ত হীরা জহরত নিয়ে খোলা জানলা দিয়ে পালিয়েছে।

আততায়ী তাহলে জানলা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল?

তাই তো মনে হয়?

হীরা জহরত সবই চুরি গিয়েছিল?

সমস্ত। একেবারে লোপাট। এমনকি তার কাঠের হাতবাক্সে যে টাকাপয়সা ছিল তাও চোর ফেলে যায় নি।

কাঠের হাত-বাক্স। তাতেই কি বৈকুণ্ঠবাবু হীরা জহরত গুলো রাখতেন?
ঘরে আর কিছুই ছিল না। সিন্দুক, আলমারি কিছু না।

ঘরে একটা মাদুর, একটা বালিশ, ঐ হাতবাক্সটা, পানের বাটা আর জলের কলসী ছাড়া কিছুই ছিল না।

পানের বাটা! সেটা ভাল করে দেখেছিলে তো?

ওহে, তোমরা আমাদের যতটা গাধা মনে কর, সত্যিই আমরা ততটা নই। পানের বাটার মধ্যে একদলা চুন, খানিকটা খয়ের সুপুরি - লবঙ্গ - আর পানের পাতা ছিল।

উনি নিজে পান সেজে খেতেন।

হুমম! জহরতগুলো বাজারে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে কি না সে খবর পেয়েছ?

এখনো বাজারে আসেনি। এলে আমরা খবর পেতুম। চারিদিকে গোয়েন্দা আছে।

বেশ। তারপর?

তারপর আর কি। ঐ পর্যন্ত। বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে দোকানের সোনা রূপো বিক্রি করে সামান্য টাকা পেয়েছে এবং স্থানীয় একজন প্রবীণ উকিল - তারাশঙ্করবাবু - তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন।

হুঁ। মেয়েটি কি বিধবা?
স্বামীটা মাতাল দুশ্চরিত্র — আগে থিয়েটার করে বেড়াত। তারপর হঠাৎ এক সার্কাস পার্টির সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যায়।

মেয়েটির বয়স কত? চরিত্র কেমন?

তেইশ-চব্বিশ হবে। যতদূর জানি চরিত্র ভালই। মানে তার চেহারা যেমন তাতে চরিত্র ভাল থাকার পক্ষে অনুকূল - স্বামীকে নেহাৎ দোষ দেওয়া যায় না।

বুঝেছি। আর কোনও আত্মীয় স্বজন নেই?
না-থাকারই মধ্যে। মৃত্যুর খবর পেয়ে যারা এসেছিল, এক ফোঁটাও রস না পেয়ে কেটে গেছে।

ব্যাপারটা বেশ অভিনব হলেও অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর কিছু করতে পারা যাবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া দুদিনের জন্য এসে তোমার কাজে হস্তক্ষেপ করা সেটাও ঠিক হবে না।

না-না, অফিসিয়ালি তোমাকে কিছু করতে তো বলছি না। সব দেখে শুনে যদি কোনও আইডিয়া —
বেশ, তাই হবে। এখন ভূতের কথাটা কি বলছিলে বল?

বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার পর ঐ বাড়িতে একজন নতুন ভাড়াটে এসেছেন। তিনি আসার পর থেকেই বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে।
??

পনেরো হাত লম্বা একটি প্রেতাত্মা রাতে ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারে।

বল কি?
হ্যাঁ। বাড়ির লোক ছাড়াও আরো কেউ কেউ দেখেছে। এখানে বরদাবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন —
আসতে পারি?

আরে! আসুন, আসুন। নাম করতে না করতেই এসে পড়েছেন যে! অনেকদিন বাঁচবেন। শৈলেনবাবুও আছেন -
- বেশ-বেশ। আসুন।

ব্যোমকেশ, বরদাবাবু হচ্ছেন একজন ভূতের বিশেষজ্ঞ। ব্যাপারটা ওঁর মুখেই শোনো।

প্রাথমিক আলাপপরিচয় শেষ হলে জানা গেল এরা কখনও আগে ব্যোমকেশের নাম শোনেনি। বরদাবাবু এখানকারই বাসিন্দা। আর্থিক অবস্থা ভাল। প্রেততত্ত্বের চর্চা করেন।

শৈলেনবাবু স্বাস্থ্যের জন্য মুঙ্গেরে এসেছিলেন। এখন এখানেই একটি বাড়ি কিনে থাকার ইচ্ছা।
ব্যোমকেশবাবু, আমার বিশ্বাস গয়ায় পিন্ডি না দিলে তাঁর আত্মার সদ্গতি হবে না। আপনি প্রেতযোনি বিশ্বাস করেন?

অবিশ্বাসও করি না। প্রেতযোনি আমার হিসেবের বাইরে।
আপনি হিসেবের বাইরে রাখতে চাইলেও তারা যে

শৈলেনবাবু, আপনিও তো আগে ভূত বিশ্বাস করতেন না। বুজরুকি বলে হেসে উড়িয়ে দিতেন। এখন?

এখন গোঁড়া ভক্ত। সত্যি ব্যোমকেশবাবু, আগে এসব নিয়ে আমিও মাথা ঘামাতুম না!

কিন্তু এখানে এসে বরদাবাবুর সঙ্গে আলাপ হবার পর বুঝতে পারছি ভূতকে বাদ দিয়ে চলা এ সংসারে অসম্ভব।
কি জানি! আমাদের তো এখন পর্যন্ত বেশ চলে যাচ্ছে।

ওসব যাক। বরদাবাবু, আপনি ব্যোমকেশকে বৈকুণ্ঠবাবুর ভুতুড়ে কাহিনীটা শুনিয়ে দিন।

হ্যাঁ। সেই ভাল। তত্ত্ব আলোচনার চেয়ে গল্প শোনা ঢের বেশি আরামের।

বৈকুণ্ঠবাবুর অপঘাত মৃত্যু। পরলোকের জন্য প্রস্তুত হবার অবকাশ তিনি পাননি।

আমাদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, আত্মা সহসা, অতর্কিতভাবে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে বুঝতেই পারে না তার দেহ নেই।

আবার কখনো কখনো বুঝতে পারলেও সংসারের মোহ ভুলতে পারে না। বারবার ঘুরে ফিরে তার জীবিতকালের কর্মক্ষেত্রে আনাগোনা করতে থাকে।

বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার পর বাড়িখানা পুলিসের কবলে রইল। ওনার মেয়েকে তারাশঙ্করবাবু আশ্রয় দিলেন। পুলিস পাহারা তুলে নেবার পর এখানে নতুন ভাড়াটে এল।

কৈলাসচন্দ্র মল্লিক।
খোঁজখবর না নিয়েই তিনি বাড়িটি নিয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠবাবুর শোবার ঘরেই তিনি শুতে লাগলেন।
কৈলাসবাবুর স্ত্রী নেই – তাই কেবল চাকর বামুন নির্ভর করেই তিনি বসবাস করছিলেন।
ছয় সাত দিন কেটে যাবার পর....

রাত্রি নটা।
কৈলাসবাবু ওষুধ খেয়ে নিদ্রার আয়োজন করছেন, এমন সময়...
আঁ-আঁ-আঁ-আঁ

কৈলাসবাবুর চিৎকারে চাকরবাকর নীচে থেকে ছুটে এল।
কিন্তু মুখখানা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারপর আরও দুই রাত্রি ওই ব্যাপার ঘটল।
প্রথমে সবাই মানসিক ভ্রান্তি বলে উড়িয়ে দিলেও এখন আর তা সম্ভব হল না।
খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

একদিন আমি আর কয়েকজন বন্ধু মিলে কৈলাসবাবুর সাথে দেখা করতে গেলুম।

তিনি বললেন... গত পনেরো দিনে চারবার প্রেতমূর্তির আবির্ভাব হয়েছে।
জানলায় এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরেছে... তারপর মিলিয়ে গেছে।

তার আসার সময়ের কিছু ঠিক নেই; কখনো দুপুর রাত্রে, কখনো শেষ রাত্রে, আবার কখনো বা সন্ধ্যের সময়।

মূর্তিটা সুশ্রী নয়, চোখে একটা লুব্ধ ক্ষুধিত ভাব।
যেন ঘরে ঢুকতে চায়, কিন্তু মানুষ আছে দেখে ফিরে চলে যাচ্ছে।

!?!

এই গল্প শুনে আমরা স্থির করলুম, স্বচক্ষে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হবে।

পরদিন থেকে আমরা রোজ তাঁর বাড়িতে যাওয়া আরম্ভ করলুম। কিন্তু প্রেতযোনির দেখা নেই।

দিন দশেক পর সবাই একে একে খসে পড়তে লাগল।
শৈলেনবাবু ও যাওয়া ছেড়ে দিলেন।

আমি কেবল একলা লেগে রইলুম।

সন্ধের পর যাই, কৈলাসবাবুর সঙ্গে বসে গল্পগুজব করি, তারপর সাড়ে-দশটা এগারোটা নাগাদ ফিরে আসি।

এইভাবে আরো এক হপ্তা কেটে গেল। আমিও হতাশ হয়ে পড়তে লাগলুম।

এ কিরকম প্রেতাত্মা যে কৈলাসবাবু ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না !?

কৈলাসবাবুর ওপর সন্দেহ হতে লাগল। তারপর একদিন আমার সন্দেহ ঘুচে গেল।
আপনি দেখতে পেলেন তাকে?

হ্যাঁ... আমি দেখলুম।
তাই তো ! বৈকুণ্ঠবাবুকে চিনতে পারলেন ?

সেটা ঠিক বলতে পারি না। তবে একখানা মুখ, খুব স্পষ্ট নয়, তবু মানুষের বলে সন্দেহ নেই। কয়েক মুহূর্তের জন্য ছবির মত ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল !
আশ্চর্য ! প্রত্যক্ষভাবে ভূত দেখা সকলের ভাগ্যে হয়ে ওঠে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় শোনা কথা, নয় তো রজ্জুতে সর্পভ্রম।

শুধু বরদাবাবু নন, তারপর আরো অনেকে দেখেছেন।
আপনিও দেখেছেন নাকি?

হ্যাঁ... আমিও। বরদাবাবুর মত অত স্পষ্টভাবে নয়, তবে দেখেছি। এক নিমেষের জন্য।

বরদাবাবু দেখার পর আমরা কয়েকজন আবার যেতে আরম্ভ করেছিলুম। তখনই একদিন...
সেদিন শৈলেনবাবু উত্তেজিত হয়ে একটু চেঁচিয়ে ফেলেছিলেন, তাই মূর্তিটা বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি।

কৈলাসবাবু ও দেখতে পেয়েছিলেন, মনে নেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন?
হ্যাঁ, একে দুর্বল হার্ট, শচী ডাক্তার ইনজেকশন করতে আবার তাঁর জ্ঞান ফিরে এল।

তাহলে আপনাদের মতে বৈকুণ্ঠবাবুর প্রেতাত্মাই তাঁর শোবার ঘরের জানলায় দেখা দিচ্ছেন?

তাছাড়া আর কি হতে পারে?

বৈকুণ্ঠবাবুর খুনের একটা কিনারা হলে হয়তো তাঁর আত্মার সদগতি হত। মনে হয়... পরলোক যদি থাকে তবে প্রেতযোনির প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক নয়।
তা তো নয়ই। প্রেতযোনির কেবল দেহ নেই, আত্মা তো অটুট আছে।

বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করা যায়? তাঁকে দু-একটা প্রশ্ন করতুম।

চেষ্টা করতে পারি বলে। আপনি গোয়েন্দা শুনলে তারাশঙ্করবাবু আপত্তি করবেন না। আজ উঠি তা হলে?

আচ্ছা, আমরা ভুত দেখতে পাব না?
একদিনেই দেখতে পাবেন একথা বলব না; তবে লেগে থাকলে অবশ্যই পাবেন। আজই চেষ্টা করা যেতে পারে। যাবেন কৈলাসবাবুর বাড়ি?

বেশ তো, যাব। ওটা দেখার আমার বিশেষ আগ্রহ আছে। একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যাবে।

তাহলে ও বেলা পাঁচটা নাগাদ আসব।

বরদাবাবু ও শৈলেনবাবু চলে যাবার পর....
কি মনে হল? আশ্চর্য নয়?
তোমার খুনের গল্প আর ওনার ভুতের গল্প, দুটোই সমান আজগুবি লাগল।

মানে! আমার খুনের গল্পে আজগুবি কি পেলে?

বরদাবাবুর গপ্পে তবু একটা ভুত দেখা গেছে, তোমার তা ও নেই। অজিত, ওঠো - স্নান করে একটি নিদ্রা না দিলে শরীর স্থিতিস্থ হবে না।
!

বিকালবেলা বরদাবাবু এসে তারাশঙ্করবাবুর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

এস বরদা। এরাই বুঝি কলকাতার ডিটেক্‌টিভ?

আমি একজন সত্যান্বেষী।

সত্যান্বেষী? সেটা কি?

সত্য অন্বেষন করাই আমার পেশা — আপনার যেমন ওকালতি।

ও – আজকাল ডিটেকটিভ কথাটার বুঝি আর ফ্যাশন নেই? তা, কোন্ ধরনের সত্য আপনি অন্বেষন করেন?

এই ধরুন, বৈকুণ্ঠবাবু আপনার কাছে কত টাকা জমা রেখে গেছেন ··· এই ধরনের সত্য জানতে পারলেও আপাতত আমার কাজ চলে যাবে।

!!?

বৈকুণ্ঠ আমার কাছে টাকা রেখে গেছে, একথা আপনি জানলেন কি করে?

ওই যে বললাম, আমি সত্যান্বেষী।
!

ভারি আশ্চর্য! এরকম ক্ষমতা আমি কারুর দেখিনি! – বসুন, বসুন!

ওহে বরদা, বলি ব্যোমকেশবাবুর ও তোমার মত পোষা ভূত-টুত আছে নাকি?

আন্দাজে ঢিল ফেলেছেন, এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু আন্দাজটা পেলেন কোথায়?

বৈকুণ্ঠবাবুর ব্যাঙ্কে কোনও কোনও টাকা ছিল না। অথচ তার মত ধনী ব্যবসায়ী নগদ টাকা কিছু রেখে যাবেন না, এটা কি বিশ্বাস করা যায়?

তাহলে রাখবেন কোথায়? নিশ্চয় কোনও বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে।

তিনি মারা যাবার পর তাঁর মেয়েকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন; সুতরাং ···

আপনি ঠিক ধরেছেন। বৈকুণ্ঠর ব্যাঙ্কের ওপর বিশ্বাস ছিল না। তার নগদ টাকা যা কিছু সব আমার কাছেই রাখত, এখনো আছে।

টাকাটা ও কম নয়, কিন্তু এ টাকার কথা আমি কারো কাছে প্রকাশ করিনি। আপনারা ও করবেন না অনুরোধ করি।

কথাটা গোপন রাখার কোন ও বিশেষ কারন আছে কি?
আছে। আপনারা ভাবতে পারেন আমি বন্ধুর টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু কথাটা চেপে রাখার অন্য কারন আছে।

কারনটা কি আমাদের জানাতে অসুবিধা আছে?

একটু চিন্তা করে... গলা নামিয়ে বললেন
আপনারা হয়তো জানেন না, বৈকুণ্ঠের একটি বখাটে লক্ষীছাড়া জামাই আছে।

মেয়েটাকে নেয় না, সার্কাস পার্টির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। এখন সে কোথায় আছে জানিনা, তবে কোন ও ভাবে যদি সে খবর পায় যে -

তার স্ত্রীর হাতে অনেক টাকা এসেছে তাহলে জোর করে মেয়েটাকে নিয়ে যাবে। তারপর টাকাগুলো উড়িয়ে আবার সরে পড়বে।

আমি তা হতে দিতে চাই না - বুঝলেন?
বুঝেছি।

মেয়েটার সারাজীবন এই কয়েক হাজার টাকাতেই চালাতে হবে। আমি তো আর চিরদিন বেঁচে থাকব না।

ঠিক কথা। তাঁকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে চাই। যদি অসুবিধা না হয় —

কোন ও লাভ হবে না। তবু আপনি যখন চান, এখানেই তাকে আনছি।

পাঁচমিনিট পর তারাশঙ্করবাবু ফিরে এলেন। তাঁর পিছনে এলেন একজন যুবতী।

আপনার বাবা যে আপনাকে একেবারে নিঃস্ব রেখে যাননি তা জানেন কি?
হ্যাঁ।

তারাশঙ্করবাবুর কাছে তিনি কত টাকা রেখে গেছেন তাও জানেন?
হ্যাঁ, জানি।

আপনার স্বামী কতদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন?
আট বছর।
এই আট বছরে আপনি তাকে একবারও দেখেননি?
না।

তাঁর চিঠিপত্রও পাননি?
না।
তিনি এখন কোথায় আছেন জানেন না?

না।
আপনি পৈতৃক টাকা পেয়েছেন জানাজানি হলে তিনি এসে আপনাকে নিয়ে যেতে চাইবেন··· এরকম হতে পারে?
হ্যাঁ।

আপনি তাঁর কাছে যেতে চান না?
না।
আপনার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?
যশোরে।

শ্বশুরবাড়িতে কে কে আছে?
কেউ না।
আপনার বিয়ে হয়েছিল কোথা থেকে?
নবদ্বীপ থেকে।

নবদ্বীপে আপনার জাঠতুতো ভায়েরা আছে, সেখানে গিয়ে থাকেন না কেন?

তাদের আপনি বিশ্বাস করেন না?
না।

তারাশঙ্করবাবুকেই সবচেয়ে বড় বন্ধু মনে করেন?
হ্যাঁ।
এখন বলুন তো, যে রাতে আপনার বাবা মারা যান, সে রাতে আপনি কোনও শব্দ শুনেছিলেন?

না।
হীরা-জহরত তাঁর শোবার ঘরে থাকত?
হ্যাঁ।

কোথায় থাকত তা জানেন? বা, আন্দাজ করতে পারেন?
না।

রাতে আপনার শোবার ঘর কোথায় ছিল?
একতলায়। বাবার ঘরের নিচের ঘরে।

সে রাতে আপনার ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হয়নি?
না।

আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।

তারাশঙ্করবাবুর বাড়ি থেকে বিদায় নেবার সময় —
আপনি হুঁশিয়ার লোক, হয়তো এ খুনের কিনারা করতে পারবেন। কোনও সাহায্য দরকার হলে অবশ্যই আসবেন।
ধন্যবাদ

আর মনে রাখবেন, টাকার কথাটা যেন চাউর না হয়। তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে মিথ্যে বলতে হবে।
মনে রাখার চেষ্টা করব।

রাস্তায় বেরিয়ে
তারাশঙ্করবাবু কে কি রকম বুঝলে?
ভারি বুদ্ধিমান লোক।

কেল্লায় প্রবেশ করে বাঁহাতি যে রাস্তাটা গঙ্গার দিকে গেছে তার শেষ প্রান্তে কৈলাস বাবুর বাড়ি।
বরদাবাবু আমাদের একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন।

এনারা শশাঙ্কবাবুর বন্ধু। কলকাতা থেকে এয়েছেন। ব্যোমকেশবাবু আর অজিতবাবু।
আসুন, আসুন।

পরিচয় হবার পর ব্যোমকেশ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।
জানলাটা মাটি থেকে প্রায় পনের হাত উঁচু। আশ্চর্য বটে!

সবাই আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে দিতে বলছে। আরে বাপু, বাড়ি ছাড়লে কি হবে—আমি যেখানে যাব, সেখানেই এই ব্যাপার হবে। আমি জানি এসব কেন ঘটছে। কোনও প্রেত ফেত নয়, এ অন্য ব্যাপার, আমি জানি ...
কি রকম?

এ হচ্ছে পিশাচ। আমার গুনধর পুত্রের কীর্তি।
সে কি!

হ্যাঁ, হতভাগা একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। ভদ্রলোকের ছেলে পিশাচসিদ্ধ হতে চায়।

হতভাগাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছি, তাই আমার ওপর রাগ। তার একটা গুরুদেব জুটেছে। শ্মশানে বসে মড়ার খুলিতে মদ খায়।

চাবকে আমার বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছি দুটোকে। তাই ষড় করে আমার পেছনে পিশাচ লেলিয়ে দিয়েছে।
কিন্তু এতে তার লাভ?

বুঝতে পারছেন না? আমার বুকের ব্যামো আছে, পিশাচ দেখে যদি হার্টফেল করি– ব্যাস! সব বিষয়আশয় তার ভোগে–

সহসা জানলার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন
ওই–ওই

ব্যোমকেশ লাফিয়ে জানলার সামনে গিয়ে পড়ল –

!

ব্যোমকেশ একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে বাইরে দেখতে লাগল –

নিচে মই জাতীয় কোনও জিনিস নেই, এমনকি কার্নিশ ও নেই।
দেখলেন?
দেখলুম।
কি রকম মনে হল?

কি আর মনে হবে! এ পিশাচ। আমাকে না নিয়ে ছাড়বে না।

ব্যোমকেশবাবু, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। পিশাচের হাত থেকে কেউ বাঁচে না– উউউফ

দেখুন, ভয়টাই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। আমি বলি কি, বাড়িটা নাহয় ছেড়েই দিন না।

আমিও তাই বলি। আমার বিশ্বাস, এ বাড়িতে দোষ লেগেছে— পিশাচ-টিশাচ নয়। বৈকুণ্ঠ বাবুর অপঘাত মৃত্যুর পর থেকেই—

পিশাচ হোক বা বৈকুণ্ঠ বাবুই হোক— মোটকথা এনার শরীরের জন্য ভয় পাওয়াটা একেবারে ঠিক নয়— কাজেই বাড়ি ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

আমি বাড়ি ছাড়ব না, কেন বাড়ি ছাড়ব? কী করেছি আমি যে অপরাধীর মত পালিয়ে বেড়াব?

আমার ছেলে যদি আমার মৃত্যু চায়, বেশ, আমি মরব।
পিতৃহত্যার পাপকে যে ছেলের ভয় নেই, তার বাবা হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

রাত হয়েছিল। পরদিন আবার আসব বলে আমরা ফিরে এলাম।

বাড়ি ফিরে দেখলাম শশাঙ্ক বাবু এসে গেছেন।
কি হে, কি হল?

প্রেতের আবির্ভাব হল। কিন্তু বরদাবাবুর প্রেত আর কৈলাস বাবুর পিশাচ মিলে ব্যাপারটা ক্রমেই বড় জটিল করে তুলছে।

পরদিন রবিবার ছিল। সকালে উঠেই ব্যোমকেশ—
চল, কৈলাস বাবুর বাড়িটা ঘুরে আসা যাক।

আবার ভূত দেখতে চাও নাকি? কিন্তু দিনের বেলা গিয়ে লাভ কি? রাত্রি ছাড়া তো অশরীরীর দর্শন পাওয়া যায় না।
কিন্তু যা অশরীরী নয়— তার দেখা তো পাওয়া যেতে পারে।

কৈলাস বাবুর বাড়ি, দরজা জানলা সব বন্ধ। একজন চাকর ঝাঁট দিচ্ছে।
ততক্ষণ বাগানটা একটু ঘুরেফিরে দেখি এস।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাগান— একদিকে ছাইগাদা।

ব্যোমকেশ জুতো দিয়ে ছাই সরিয়ে কি দেখতে লাগল—

একটা পুরনো টিনের কৌটো—দেখে ফেলে দিলো।
কি হে, ছাইগাদায় কি খুঁজছ বলতো?

যেখানে দেখিবে ছাই—উড়াইয়া দেখ তাই—আরে — এটা কি?

একটা চিড় খাওয়া ভাঙ্গা চিমনি—ভেতরে পাকান কাগজ

কি দেখছ হে? ওতে কী আছে?

একটা ছাপানো ইস্তাহারের কাগজ, জীবজন্তুর ছবি দেওয়া—ছাপার কালি ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—

হাতের লেখা রয়েছে — দেখ তো পড়তে পার কি না?

কালির চিহ্ন মাত্র নেই—আঁচড়ের দাগ দেখে দু একটা শব্দ অনুমান করা যায়।

বিপদে — হাতে টাক — বাবা — নচেৎ — মরীয়া — তোমার স্বাথী —
হ্যাঁ, আমার ও তাই মনে হচ্ছে। কাগজটা থাক।

লেখক বোধহয় বানান ভুল করেছে। সাথী না লিখে স্বাথী লিখেছে।
শব্দটা স্বাথী নাও হতে পারে।

চলো, চলো, জঞ্জাল ঘেঁটে লাভ নেই, এতক্ষনে বোধহয় কৈলাস বাবু উঠে পড়েছেন।

হ্যাঁ, ওই যে তার ভৌতিক জানলা খোলা দেখছি।

বাড়ির কাছে গিয়ে দেখা গেল কৈলাস বাবু জানলা দিয়ে বাইরে দেখছেন —
আসুন, আপনারা ওপরে আসুন।

চা প্রস্তুত হয়ে ছিল। চা পানের সঙ্গে নানারকম কথা হতে লাগল।
রাতে আপনি জানলা বন্ধ করে শুচ্ছেন তো?

হ্যাঁ, যদিও ডাক্তারের বারণ। কিন্তু উপায় কি?
জানলা বন্ধ করে কোনও ফল পেয়েছেন?

বিশেষ নয়। দেখা দিতে পারেন না বলে জানলায় সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে চলে যাচ্ছে।

একা শুতে পারি না, রাতে একজন চাকর মেঝেয় বিছানা পেতে আমার ঘরে শুচ্ছে।

এইবার আমি ঘরটা একবার ভাল করে দেখব। যদি কিছু বাদ পড়ে গিয়ে থাকে –
তা দ্যাখো, কিন্তু এতদিন পরে আর কিছু পাবে বলে মনে হয় না।

এতদিন পরে যদি বৈকুণ্ঠ বাবুর হত্যাকারীর কোনও চিহ্ন বার করতে পার তাহলে বুঝব তুমি জাদুকর।
তাই বুঝো। সে কথা যাক। বৈকুণ্ঠ বাবুর মৃত্যুর দিন এঘরে কোনও আসবাবই কি ছিল না?

বলেছি তো, মাটিতে পাতা বিছানা, জলের ঘড়া আর পানের বাটা। হ্যাঁ, একটা কানখুস্কিও পাওয়া গিয়েছিল বটে।

বেশ, আপনারা তাহলে গল্প করুন। আমি শুধু ঘরময় ঘুরে বেড়াব মাত্র।

এরপর ব্যোমকেশ ঘর পরীক্ষা করতে লাগল।
দক্ষিণ দিকের দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে খুব কাছ থেকে দেখে নিজের মনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

কি হল আবার? হাসছ যে?
জাদু! দেখে যাও। এটা নিশ্চই তোমরা আগে দেখনি।

প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে দেখলাম দেয়ালে সাদা চুনের ওপর আঙুলের ছাপ রয়েছে।

একটা বুড়ো আঙুলের ছাপ দেখছি, এর মানে কী?
মানে– মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। হত্যাকারীর এই পরিচয় চিহ্নটা তোমরা দেখতে পাওনি।

হত্যাকারীর!! এ আঙুলের দাগ যে হত্যাকারীর তা তুমি বুঝলে কি করে? যে রাজমিস্ত্রী চুনকাম করেছিল তারও তো হতে পারে?
হতে পারে, কিন্তু রাজমিস্ত্রী অকারণ নিজের আঙুলের ছাপ ফেলতে যাবে কেন বল তো?

তা যদি বল, তবে হত্যাকারীই বা তার হাতের ছাপ রেখে যাবে কেন?
তাও তো বটে, তাহলে তোমার মতে ওটা কিছুই নয়?

আমি বলতে চাই, ওটা যে খুব দরকারি তার প্রমান পাওয়া যাচ্ছে না।
তা বটে। পকেটে ছুরি আছে? কিম্বা কানখুস্কি?

ছুরি আছে। কেন?
দাও তো।

ব্যোমকেশ ছুরি দিয়ে চিহ্নটার চারধারে দাগ কেটে একটু চাড় দিয়েই একটু প্লাস্টার বার করে আনল। পকেটে রেখে—

আপনার দেয়ালটা কুশ্রী করে দিলাম। দয়া করে একটু চুন দিয়ে ভরাট করে নেবেন।

আমাদের এখানকার কাজ আপাতত শেষ হয়েছে।
ও ভাল কথা, আপনি বাড়ি থেকে নিয়মিত চিঠিপত্র পান তো?
কে দেবে? ছেলের গুনের কথা তো শুনলেন। আর কেউ সেরকম নেই।

আচ্ছা, আজ চললুম। মাঝে মাঝে বিরক্ত করতে আসব। এই শর্ত টার কথা কাউকে বলার দরকার নেই।

ফেরার সময়
ব্যোমকেশ, ওই ছাপটা সম্বন্ধে তোমার সত্যিকার ধারনা কি?
বললাম তো, ওটা হত্যাকারীর আঙুলের ছাপ।

এ তোমার জোর করে বলা। কে হত্যাকারী তার নামগন্ধ নেই— একটা সঙ্গত কারন তো থাকা চাই?
কি রকম সঙ্গত কারন তুমি দেখতে চাও?

আমি কিছুই দেখতে চাইনা। আমার মনে হয় তুমি ছেলেমানুষি করছ। তুমি ভাবছ বাংলাদেশে যে ভাবে গোয়েন্দাগিরি করেছ এখানেও সে ভাবে কাজ হবে। কিন্তু সেটা ভুল।

ভাই, আমার গোয়েন্দাগিরি দেখাবার জন্য তো আমি এখানে আসিনি। তুমি যদি মনে কর এ ব্যাপারে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই, তাহলে তো আমি নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে যাই।

শশাঙ্ক বাবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন
আরে, না না। আমি তা বলছি না। আমার বলার উদ্দেশ্য এটা অত সহজ ব্যাপার নয়।
তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

আঙুলের দাগ, ছেঁড়া কাগজ, দুটো অক্ষর, এসব দিয়ে গোয়েন্দা উপন্যাস লেখা চলে, পুলিসের কাজ চলে না। তাই বলছি –
থামো।

একটা গাড়ি আসছিল। সেটা দেখেই ব্যোমকেশ শশাঙ্ক বাবু কে চুপ করতে ইশারা করল।

তারাশঙ্করবাবু গঙ্গা থেকে চান করে ফিরছেন। গাড়িটা আমাদের সামনে এসে থেমে গেল।
কি ব্যোমকেশ বাবু? তারপর কদ্দুর?
কিসের কদ্দুর?

কিসের আবার – বৈকুণ্ঠর খুনের। কিছু পেলেন?
আমার কিছু জানবার কথা নয়। বরং শশাঙ্ককে

কিন্তু শুনেছিলাম যেন, আপনিই নতুন করে এ কেসের অনুসন্ধান করছেন। তা যাই হোক, শশাঙ্কবাবু কিছু নতুন আবিষ্কার হল?

হলেও তা পুলিসের গোপন কথা, সাধারনে প্রকাশ করার আমার অধিকার নেই। আর আপনি ওটা ভুল শুনেছেন। এঁরা আমার বন্ধু, এখানে বেড়াতে এসেছেন। কেসের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই।

বেশ, বেশ, তাহলে কিছুই পারেননি। আপনাদের দ্বারা যে এর বেশি হবে না তা আগেই আন্দাজ করেছিলুম। ড্রাইভার – চালাও।

গাড়ি চলে গেল। সকলেই খারাপ মেজাজে বাসায় ফিরলাম।

বিকালবেলা বরদাবাবু আসলেন।
এখানে আমাদের বাঙালিদের একটা ক্লাব আছে। চলুন, আজ আপনাদের সেখানে নিয়ে যাই।

কেল্লার বাইরে ক্লাব। পথে যেতে যেতে দেখলাম মাঠের মাঝখানে প্রকান্ড তাঁবু পড়েছে।
ওটা কি?
সার্কাস পার্টি এসেছে।

এখানে আবার সার্কাস ও আসে?
বিলক্ষণ আসে, বেশ দুপয়সা কামিয়ে নিয়ে যায়। গতবছর – না না, তার আগের বছর শেষ এসেছিল।

কাল শনিবার ছিল। কাল থেকে এরা খেলা দেখাচ্ছে।

কথা বলতে বলতে আমরা ক্লাবে এসে পৌঁছলাম।
খোলা জায়গার ওপর কয়েকখানি ঘর।

একটা ঘরে ব্রিজ খেলা চলছে। পাশের ঘরে বেশ উত্তেজিত গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। বরদা বাবু আমাদের সেই ঘরে নিয়ে গেলেন।

কয়েকজন সেই ঘরে শশাঙ্ক বাবু কে ঘিরে ভূতযোনি নিয়ে আলোচনা করে চলেছে। আমাদের দেখেই -
আসুন আসুন বরদাবাবু; এই যে ব্যোমকেশ বাবুও এসেছেন। আসুন। এরা আমাকে একেবারে -

আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর
কী ব্যাপার? তোমরা এত উত্তেজিত কেন? কী হয়েছে?

ওরা আমার ভূত দেখার কথা বিশ্বাস করছে না। বলছে ওটা আমারই মনগড়া একটা মূর্তি।

আমরা বলতে চাই, বরদার আষাঢ়ে গল্প শুনে শুনে এমন হয়েছে উনি ঝোপে ঝোপে বাঘ

হয়তো যেটাকে উনি ভূত মনে করছেন, সেটা আসলে একটা বাদুড় বা ওই জাতীয় কোনও কিছু।
আমি স্বীকার করছি আমি স্পষ্ট ভাবে কিছু দেখিনি। তবে ওটা যে বাদুড় নয় তা হলফ করে বলতে পারি।

এরা দুজন সবে কাল সকালেই এখানে এসেছেন। এঁদের ও আমি গল্প শুনিয়ে বশীভূত করে ফেলেছি বলে সন্দেহ হয় কি?

আপনারা সত্যি দেখেছেন না কি?

হ্যাঁ।
কী দেখেছেন?
একটা মুখ।

বেশ, তা না হয় মানা গেল যে অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু কেন?
বৈকুণ্ঠ জহুরী ভূত হয়ে এসে কৈলাস বাবুকে বিরক্ত করছে কী উদ্দেশ্যে?
এইটা কি কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার?

শোন অমূল্য, প্রেতযোনির উদ্দেশ্য সব সময় বোঝা যায় না। তবে আমার মনে হয়, বৈকুণ্ঠ বাবু কিছু বলতে চান।

বলতে চান তো বলছেন না কেন?
সুযোগ পাচ্ছেন না। তাঁকে দেখেই আমরা এত আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি যে তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে।

তাছাড়া প্রেতের মূর্তি ধারণ করার ক্ষমতা থাকলেও সবসময় কথা কইবার ক্ষমতা থাকে না। একটোপলাজম নামে যে বস্তুটা মূর্তি ধারণ করার আসল উপাদান -
জ্ঞান দিও না বরদা। স্পিরিচুয়ালিজম এর বইগুলো যে তোমার ঝাড়া মুখস্ত তা জানি।

তোমার প্রেত যদি কথাই না বলবে তবে নিরীহ একটি লোককে জ্বালাতন করছে কেন?
মুখে কথা না বললেও তাঁকে কথা বলাবার

কী উপায়? ও - সেই তেপায়া টেবিল? সে তো জোচ্চুরি।
কী করে জানলে? কখনো পরীক্ষা

আমার দৃঢ় বিশ্বাস বৈকুণ্ঠ বাবুর কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের উচিত তাঁকে সাহায্য করা। টেবিল চেলে ডাকলে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন।
বেশ তো, করা হোক না। এখানেই করা হবে?

দোষ কি? এখানেই করা যাক। কি বল তোমরা? সবার সামনেই তবে প্রমাণ হয়ে যাবে।

বরদাবাবু বললেন বেশি লোক থাকলে অসুবিধে। আমরা পাঁচজন রইলাম। অন্যেরা পাশের ঘরে গেলেন। তেলের বাতির আলো কমিয়ে দেওয়া হল।

এবার একমনে সবাই বৈকুণ্ঠ বাবুকে ভাবতে থাকুন — শব্দ করবেন না। কোনও কথা বলবেন না।

কিছুক্ষণ পর বরদাবাবু বললেন
বৈকুণ্ঠ বাবু এসেছেন কি? যদি এসে থাকেন একবার টোকা দিন।

কোনও সাড়াশব্দ নেই। কিছুক্ষন সব চুপচাপ। তারপর টিপাইয়ের একটা পায়া ধীরে ধীরে শুন্যে উঠে ঠক করে নিচে পড়ল।

আবির্ভাব হয়েছে! আমিই প্রশ্ন করি? কি বলেন?
আমরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

আপনি বারবার দেখা দিচ্ছেন কেন?
কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?

এবার টেবিলের পায়া উঠতে পড়তে লাগল।
ঠক
ঠক

যদি হ্যাঁ বলতে চান, একবার টোকা দিন, না বলতে চাইলে দুবার। আপনি যা বলতে চান, অক্ষর গুনে গুনে টোকা দিন, তাহলে আমরা বুঝতে পারব।
টেলিগ্রাফে কথা আরম্ভ হল, এবং অনেকক্ষন ধরে যে কথাগুলো বেরিয়ে এল

বাড়ি — ছেড়ে — যাও — নচেৎ — অমঙ্গল —
আপনার বাড়ি যাতে ছেড়ে দেওয়া হয় — সে ব্যাবস্থা আমরা করব। আর কিছু?
টেবিল স্থির হয়ে রইল।

হঠাৎ মনে হতেই ফিসফিস করে বললাম
হত্যাকারী কে জিজ্ঞাসা করুন।

আপনাকে কে খুন করেছে? খুনি কে?
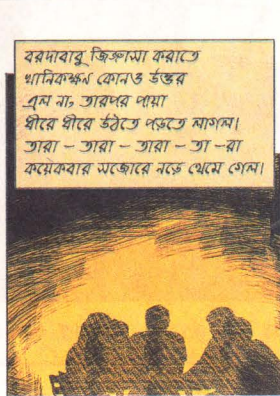
বরদাবাবু জিজ্ঞাসা করাতে খানিকক্ষন কোনও উত্তর এল না, তারপর পায়া ধীরে ধীরে উঠতে পড়তে লাগল। তারা — তারা — তারা — তা — রা কয়েকবার সজোরে নড়ে থেমে গেল।

ক — কী বললেন, বুঝতে পারলুম না! তারা — কী? কারো নাম?
কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

আপনি কি আছেন? — চলে গেছেন!

টেবিল জড়বস্তুতে পরিনত হয়েছে। ব্যোমকেশ আলোটা উজ্জ্বল করে দিল।
মাফ করবেন, এখন কেউ টেবিল থেকে হাত সরাবেন না। আপনাদের হাত আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

আমরা কেউ হাতে আঠা লাগিয়ে রেখেছি কিনা দেখতে চান? বেশ — দেখুন।
ব্যোমকেশ নির্লজ্জ ভাবে সবার হাত পরীক্ষা করতে লাগল। অজিত ও বাদ গেল না। কিন্তু কারো হাতে কিছুই পাওয়া গেল না।

কিছু পেলেন না তো?
আশ্চর্য! এ যেন কল্পনাও করা যায় না!

শশাঙ্ক বাবু মনে মনে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আমরা শহর ঘুরে সময় কাটিয়ে দিলাম। শুধু প্রত্যেক সন্ধেবেলায় কৈলাস বাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁকে বাড়ি ছাড়ার জন্য বোঝান হতো। শেষে একটা ভাল বাড়ি পেয়ে তিনি আগামী রবিবার উঠে যাবেন ঠিক হল।

ভাই, তোমার ভাবগতিক দেখে আমার মনে হয়েছিল পুলিস আমার সাহায্য নিতে চায় না, বাংলাদেশে আমরা যে প্রথায় কাজ করি তা তোমাদের কাছে হাস্যকর, হাতের ছাপ, ছেঁড়া কাগজ নিয়ে তোমাদের অশ্রদ্ধার শেষ নেই। তাই আমি আর উপযাচক হয়ে কিছু বলতে চাইনি।
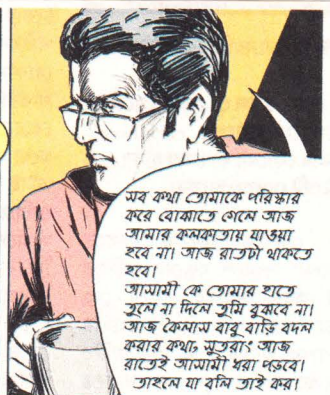
রাত নটায় কৈলাস বাবুর পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে আমরা হাজির হলাম।

শশাঙ্কবাবু শিস দিতেই অন্ধকার থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল।

ব্যোমকেশ তাকে ফিসফিস করে কিছু বলতেই সে আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা নিঃশব্দে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলাম।
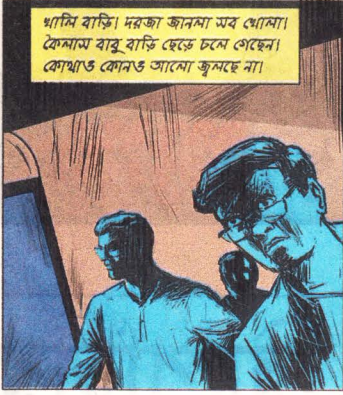
খালি বাড়ি। দরজা জানলা সব খোলা। কৈলাস বাবু বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না।

পা টিপে টিপে ওপরে উঠে কৈলাস বাবুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশ টর্চ জ্বালল।

ঘর একদম খালি।
তোমরা বস। কতক্ষন অপেক্ষা করতে হবে জানিনা। অজিত, আমি টর্চ জ্বালালেই তুমি জানলা আগলে দাঁড়াবে। আর শশাঙ্ক তুমি প্রেত কে চেপে ধরবে।

অন্ধকার ঘরে তিনজনে বসে পড়লাম। এবার শুধু অপেক্ষা।

কতক্ষন কেটে গেছে জানি না। প্রায় ঘন্টা দুয়েক হবে। একটা হাই তুলতে যাচ্ছিলাম, ব্যোমকেশের হাতটা সাঁড়াশির মত আমার পায়ে চাপ দিল।

চোখে কিছুই দেখলাম না – শুধু মেঝের ওপর পা ঘষে চলার মত খস খস শব্দ শুনতে পেলাম।

ক্ষীণ একটা আলো ঘরে এসে পড়ছিল, তাতেই দেখতে পেলাম একটা লম্বা কালো মূর্তি –

মূর্তিটা আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার হাতের ছোট্ট টর্চের আলোয় দেয়ালের গায়ে কি যেন খুঁজছে।

সে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে যেতেই ব্যোমকেশের হাতের জোরালো টর্চ জ্বলে উঠল।
!

লাফ দিয়ে অজিত জানলা আগলে দাঁড়াল – মূর্তি টাও জানলার দিকে লাফ দিল।

মূর্তিটা জানলা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই অজিত তাকে চেপে ধরল –
সে প্রানপনে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল –
তখনি শশাঙ্কবাবু পিছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।
লেগে গেল তিনজনের ধুন্ধুমার
এই সময় টর্চের আলোয় তার বীভৎস মুখখানা দেখতে পেলাম
ব্যোমকেশ মুখোশ টা টেনে খুলে ফেলল।
পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই শৈলেনবাবু। জানলার কাছে আপনার রন – পা নেই। ওখানে পুলিসের লোক অপেক্ষা করছে।
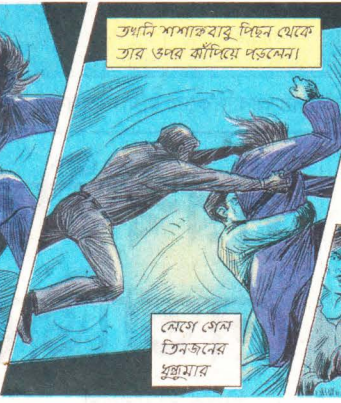
সিং জি – উপর আ জাইয়ে –

শশাঙ্ক তুমি এবার ওনাকে ছাড়তে পার। পালাবার পথ বন্ধ।
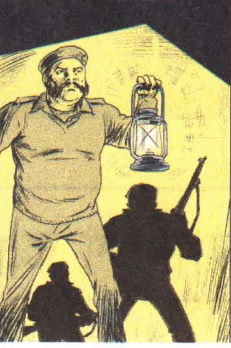
জমাদার ভানুপ্রতাপ সিং সদলবলে এসে পড়লেন।

সাব, আপকা খুন নিকাল রহা হ্যায়।
হ্যাঁ। কামড়ে দিয়েছে কাঁধে।

শশাঙ্ক তুমি শৈলেন বাবুকে চেন বটে, তবে ওনার সব পরিচয় হয়তো জান না।
উনি সার্কাসের একজন নামজাদা খেলোয়াড়, এবং বৈকুণ্ঠ বাবুর নিরুদ্দিষ্ট জামাই।

কৈলাস বাবু তাঁর পুরনো বাসায় ফিরে এসেছিলেন। নিজের ছেলেকে সন্দেহ করার জন্য অনুতপ্ত ছিলেন। যাবার আগে সকালে তাঁর ঘরে জমায়েত হয়েছিলাম সবাই।

ব্যোমকেশ ঘড়ি দেখে –
সতের মিনিট সময় আছে। যা বলার এর মধ্যেই বলে আমি স্টেশন ছুটব।
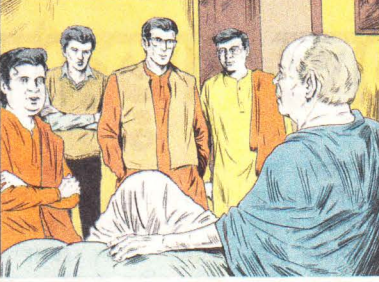
উফফফ – কি ধড়িবাজ লোক! মনে আছে একবার এই ঘরে বসেই – ওই ওই করে চেঁচিয়ে উঠেছিল। আসলে কিছুই দেখেনি! যাক – এবার একটু বলুন, কী করে বুঝলেন?

বরদা বাবু কিছু মনে করবেন না। প্রেতযোনি সম্বন্ধে আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল।
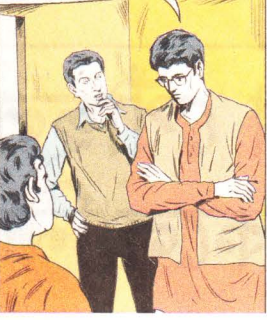
ভুত আছে কি নেই তা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলছি না, কিন্তু এখানে যিনি বারবার দেখা দিচ্ছিলেন তিনি যে ভুতপ্রেত নন – মানুষ – এটা আমার গোড়া থেকেই মনে হচ্ছিল।

এখন যদি ওই ভুতটা সত্যি মানুষ হয়, তাহলে সে কে? কেন এমন করছে? প্রথম এই প্রশ্নটাই আসে।

একটা লোক ভুত সেজে বাড়ির লোককে ভয় দেখাবে কেন? এর একমাত্র উত্তর, সে বাড়ি থেকে লোক সরাতে চায়! ভেবে দেখুন, এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন – কেন বাড়িছাড়া করতে চায়? কিসের স্বার্থে? আপনারা সকলেই জানেন বৈকুণ্ঠ বাবু মারা যাবার পর তাঁর মুল্যবান হীরা জহরত কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিসের সন্দেহ সেগুলো তিনি একটা কাঠের বাক্সে রাখতেন এবং হত্যাকারী সেগুলো নিয়ে গেছে।

আমার কিন্তু এটা এত সহজে বিশ্বাস হয়নি। বৈকুণ্ঠ জহুরীর চরিত্র যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় তিনি মুল্যবান হীরে জহরত কাঠের বাক্সে রাখার লোক ছিলেন না।
কোথায় তিনি সেগুলো রাখতেন তা কেউ জানে না। অথচ এই ঘর থেকেই বার করে সেগুলো খদ্দের কে তিনি দেখাতেন।

তাহলে প্রশ্ন – কোথায় রাখতেন? সেটা পরে বলছি। তার আগে বলি এই ভৌতিক উৎপাতের একমাত্র কারন হল যে হত্যাকারী সেগুলো নিয়ে যাবার সুযোগ পায় নি। অথচ সে জানত সেগুলো কোথায় রাখা আছে।

তাই সে নতুন বাসিন্দাদের তাড়াতে চেষ্টা করেছে বারবার, যাতে সে নিরাপদে জিনিসগুলো সরাতে পারে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে ভুতই বৈকুণ্ঠ বাবুর হত্যাকারী।

বৈকুণ্ঠ বাবুর মেয়েকে প্রশ্ন করেই আমার খটকা লেগেছিল। প্রথমত নীচের ঘরে শুয়েও তিনি কোনও শব্দ শুনতে পাননি, আর দ্বিতীয় কথা বাপের সম্পত্তির জন্য তিনি পিনডি দিতে চাননি।
এবার দেখুন – প্রেত দোতলার জানলা দিয়ে উঁকি মারে – অথচ কোনও মই ব্যাবহার করে না। তাই রন – পা। বৈকুণ্ঠ বাবুর জামাই নিখোঁজ প্রায় আট বছর – সার্কাস দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় – নিশ্চয়ই ভাল খেলোয়াড়।

জঞ্জাল থেকে যে কাগজের টুকরো পেয়েছিলাম, সেটা একটা সার্কাসের ইসতাহার। যার পিছনে কয়েকটা বাংলা শব্দ লেখা ছিল। অজিত ভুল করে যেটাকে সার্থী ভেবেছিল সেটা আসলে স্বামী – স্বামী অর্থাভাবে পড়ে স্ত্রীর কাছে টাকা চাইছে।

কিছুদিন পর স্বামী মুঙ্গেরে এসে স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকের মত বাস করতে লাগলেন। তার আসল পরিচয় কেউ জানত না।

সেই রাতে রন – পায়ে জানলা দিয়ে শ্বশুর মশাইএর ঘরে এসে তার গলা টিপে তাঁর কাছ থেকে হীরা জহরতের গুপ্তস্থান জেনে নিয়ে তাঁকে খুন করলেন। কিন্তু স্ত্রী এসে দরজায় ধাক্কা দিতে জিনিসগুলো নেওয়া হল না।

একটি জহরত নিয়ে পানের বাটার চুন দিয়ে গর্তটা ভরাট করে পালিয়ে যান। কিন্তু তাড়াহুড়োতে বুড়ো আঙুলের ছাপ রয়ে যায়।

তার মানে! সব হীরা জহরত বৈকুণ্ঠ বাবু তার ঘরের দেওয়ালে গর্তের মধ্যে রাখতেন?

হ্যাঁ। তিনি পান খেতেন। তাই পানের বাটার চুন দিয়েই বারবার গর্ত ভরাট করে দিতেন। তাই কেউ ভাবতেও পারতনা একথা।
তা – তাহলে – এখন সেই হীরা জহরত?

ওটা তোমাকে একটু মেহনত করে বার করতে হবে ভাই। আমার সময় নেই, নাহলে আমিই বার করে দিতুম। তবে তোমার জন্য একটু সুবিধা করে রেখেছি, দেওয়ালে পেন্সিলের দাগ দিয়ে রেখেছি।

সেদিন প্ল্যানচেট টেবিলে আমার আরও সুবিধা হয়ে গেল। ভুতের আবির্ভাব হতেই বুঝলাম আমাদেরই মধ্যে একজন টেবিল নাড়ছেন, এবং তিনিই খুনি।

ভুতের কথাগুলোই তার প্রমান। হাত পরীক্ষা করেই শৈলেন বাবুর আঙুলের দাগ মিলে গেল।

আঃ – বাঁচলুম। ব্যোমকেশ বাবু, আর কিছু না হোক বরদার ভূতের হাত থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন।

ও যেরকম করে তুলেছিল – আর একটু হলেই আমিও ভূতে বিশ্বাসী হয়ে পড়ছিলাম আর কি, আপনি বরদার ভূতের রোজা, অজস্র ধন্যবাদ।
সবাই হেসে ফেলল।

বরদাবাবু বিড়বিড় করে কী একটা বললেন –
ওটা আবার কী বললে? সংস্কৃত বুলি আওড়াচ্ছে মনে হল যেন?

মৌক্তিকং ন গজে গজে। একটা হাতির মাথায় গজমুক্তা পাওয়া গেল না বলে গজমুক্তা নেই, একথা সিদ্ধ হয় না।
গজের মাথায় কী আছে কখনো তলাশ করিনি, কিন্তু তোমার মাথায় কি আছে তা আমরা সবাই জানি।

আমার সময় শেষ। এবার তাহলে চললুম। তারাশঙ্কর বাবুর কাছে আগেই বিদায় নিয়ে এসেছি। – মহাপ্রান লোক।

তাঁকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাবেন। এস অজিত।